B.D

Bengali

General

Semester – III

আত্মচরিত || শিবনাথ শাস্ত্রী

Scanned by CamScanner

প্রসঙ্গ : শিবনাথ শাস্ত্রী

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ ছিল না। তাঁহাকে আমি যেটুকু চিনিতাম, সে আমার পিতার সহিত তাঁহার যোগের মধ্য দিয়া। আমার পিতার জীবনের সঙ্গে তাঁহার সুরের মিল ছিল। মতের মিল থাকিলে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হয় ভক্তি হয়, সুরের মিল থাকিলে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ ঘটে।

আমার পিতার ধর্মসাধনা তত্ত্বজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। অর্থাৎ তাঁহার সাধনা খালকাটা জলের মতো ছিল না, সে ছিল নদীর স্রোতের মতো। সেই নদী আপনার ধারার পথ আপনি কাটিয়া সমুদ্রে গিয়া পৌঁছে। এই পথ হয়ত বাঁকিয়া-চুরিয়া যায়, কিন্তু ইহার গতির লক্ষ্য আপন স্বভাবের বেগেই সেই সমুদ্রের দিকে। গাছ আপন সকল পাতা মেলিয়া সূর্যালোককে সহজেই গ্রহণ করে এবং আপন জীবনের সহিত তাহাকে মিলিত করিয়া আপনার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত ও সঞ্চিত করিয়া তুলে। এই গাছকে বাধার মধ্যে রাখিলেও সে স্বভাবের একাগ্র প্রেরণায় যে-কোনো ছিদ্রের মধ্য দিয়া আপন আকাঙ্ক্ষাকে সূর্যালোকের দিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। এই আকাঙ্ক্ষা গাছটির সমগ্র প্রাণশক্তির আকাঙ্ক্ষা।

তেমনি বুদ্ধিবিচারের অনুসরণে নয় কিন্তু আত্মার প্রাণবেগের ব্যাকুল অনুধাবনেই পিতৃদেব সমস্ত কঠিন বাধা ভেদ করিয়া অসীমের অভিমুখে জীবনকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সমগ্রজীবনের সহজ ব্যাকুলতার স্বভাবটি শিবনাথ ঠিকমতো বুঝিয়াছিলেন। কেননা তাঁহার নিজের মধ্যেও আধ্যাত্মিকতার এই সহজ বোধটি ছিল।

তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে যে-সংস্কারের মধ্যে জন্মিয়াছিলেন তাহার বাধা অত্যন্ত কঠিন। কেননা, সে শুধু অভ্যাসের বাধা নহে; শুধু জন্মগত বিশ্বাসের বেষ্টন নহে। মানুষের সবচেয়ে প্রবল অভিমান যে ক্ষমতাভিমান সেই অভিমান তাহার সঙ্গে জড়িত। এই অভিমান লইয়া পৃথিবীতে কত ঈর্ষা দ্বেষ, কত যুদ্ধবিগ্রহ। ব্রাহ্মণের সেই প্রভূত সামাজিক ক্ষমতা, সেই অভ্রভেদী বর্ণাভিমানের প্রাচীরে বেষ্টিত থাকিয়াও তাঁহার আত্মা আপনার স্বভাবের প্রেরণাতেই সমস্ত নিষেধ ও প্রলোভন বিদীর্ণ করিয়া মুক্তির অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। তমসো মা জ্যোতির্গময় এই প্রার্থনাটি তিনি শাস্ত্র হইতে পান নাই, বুদ্ধিবিচার হইতে পান নাই, ইহা তাঁহার জীবনীশক্তিরই কেন্দ্রনিহিত ছিল, এইজন্য তাঁহার সমস্ত জীবনের বিকাশই এই প্রার্থনার ব্যাখ্যা।

Scanned by CamScanner

জাগ্রত আত্মার এই স্বভাবের গতিটিই সকল ধর্মসমাজের প্রধান শিক্ষার বিষয়। সাধকের মধ্যে ইহারই রূপটি ইহারই বেগটি যদি দেখিতে পাই তবেই সে আমাদের পরম লাভ হয়। মতের ব্যাখ্যা এবং উপদেশকে যদিবা পথ বলা যায় কিন্তু দৃষ্টি বলা যায় না। বাঁধা পথ না থাকিলেও দৃষ্টি আপন পথ খুঁজিয়া বাহির করে। এমন-কি, পথ অত্যন্ত বেশি বাঁধা হইলেই মানুষের দৃষ্টির জড়তা ঘটে, মানুষ চোখ বুজিয়া চলিতে থাকে, অথবা চিরদিন অন্যের হাত ধরিয়া চলিতে চায়। কিন্তু প্রাণক্রিয়া প্রাণের মধ্য দিয়াই সঞ্চারিত হয়। আত্মার প্রাণশক্তি সহজ প্রাণশক্তির দ্বারাই উদ্বোধিত হয়। কেবল বাহিরের পথ বাঁধায় নহে, সেই অন্তরের উদ্বোধনে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে সাহায্য করিয়াছেন শিবনাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি।

শিবনাথের প্রকৃতির একটি লক্ষণ বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে; সেটি তাঁহার প্রবল মানব-বৎসলতা। মানুষের ভালমন্দ দোষগুণ সব লইয়াই তাহাকে সহজে ভালবাসিবার শক্তি খুব বড় শক্তি। যাঁহারা শুষ্কভাবে সংকীর্ণভাবে কর্তব্যনীতির চর্চা করেন তাঁহারা এই শক্তিকে হারাইয়া ফেলেন। কিন্তু শিবনাথের সহৃদয়তা এবং কল্পনাদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টি দুই-ই ছিল—এইজন্য মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়া দেখিতে পারিতেন, তাহাকে সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোনো বাজারদরের কষ্টিপাথরে ঘষিয়া যাচাই করিতেন না। তাঁহার আত্মজীবনী পড়িতে পড়িতে এই কথাটিই বিশেষ করিয়া মনে হয়। তিনি ছোট.ও বড়, নিজের সমাজের ও অন্য সমাজের নানাবিধ মানুষের প্রতি এমন একটি ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন যাহা হইতে বুঝা যায় তাঁহার হৃদয় প্রচুর হাসিকান্নায় সরস সমুজ্জ্বল ও সজীব ছিল, কোনো ছাঁচে ঢালাই করিয়া কঠিন আকারে গড়িয়া তুলিবার সামগ্রী ছিল না। তিনি অজস্র গল্পের ভাণ্ডার ছিলেন—মানব-বাৎসল্য হইতেই এই গল্প তাঁর মনে কেবলি জমিয়া উঠিয়াছিল। মানুষের সঙ্গে যেখানে তাঁর মিলন হইয়াছে সেখানে তার নানা ছোট-বড় কথা নানা ছোট-বড় ঘটনা আপনি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদয়ের জালে ধরা পড়িয়াছে এবং চিরদিনের মতো তাঁর মনের মধ্যে তাজা থাকিয়া গেছে।

অথচ এই তাঁর মানব-বাৎসল্য প্রবল থাকা সত্ত্বেও সত্যের অনুরোধে তাঁহাকেই পদে পদে মানুষকে আঘাত করিতে হইয়াছে। আত্মীয়-পরিজন ও সমাজকে ত আঘাত করিয়াইছেন, তাহার পরে ব্রাহ্মসমাজে যাঁহাদের চরিত্রে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছেন, যাঁহাদের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও প্রীতি তাঁহার বিশেষ প্রবল ছিল তাঁহাদের বিরুদ্ধে বারবার তাঁহাকে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। মানুষের প্রতি তাঁহার ভালবাসা সত্যের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠাকে কিছুমাত্র দুর্বল করিতে পারে নাই। যে-ভূমিতে তিনি জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা মানবপ্রেমের রসে কোমল ও শ্যামল, আর যে-আকাশে তিনি তাহাকে বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন তাহা সত্যের জ্যোতিতে দীপ্যমান ও কল্যাণের শক্তিপ্রবাহে সমীরিত।

'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ ১৩২৬

Scanned by CamScanner

২ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

তিনি বিদ্বান, বাগ্মী, কাব্য উপন্যাস জীবনচরিত সন্দর্ভাদির সুলেখক, সুকবি, অতি সামাজিক ও হাস্যরসিক লোক ছিলেন। তাঁহার উপাসনা ও প্রার্থনায় কঠিন প্রাণও বিগলিত এবং ভক্তিরসে আর্দ্র হইত। তিনি যৌবনকালে আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের সহযোগে দেশের রাজনৈতিক দুর্দশা দূর করিবার জন্য 'ভারত সভা' স্থাপন করেন এবং তজ্জন্য পরিশ্রমও করিয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টায় তিনি একজন প্রধান কর্মী ছিলেন। ...ছেলেমেয়েদের কাগজ 'মুকুল'-এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন তিনি; বালক বালিকাদের জন্য লিখিত তাঁহার অনেক রচনা 'সখা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাদের জ্ঞানবৃদ্ধি ও চরিত্রগঠন জন্য তিনি কখনও স্বয়ং একাকী, কখনও বন্ধুদের সহযোগে 'সিটি স্কুল', 'ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়,' 'রামমোহন সেমিনারি' প্রভৃতি স্থাপন করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রধান কর্মী, প্রধান আচার্য ও প্রধান প্রচারক তিনি ছিলেন। ইহার বাংলা ও ইংরাজী মুখপত্র দুটি তিনি স্থাপন ও বহু বৎসর সম্পাদনা করেন। তৎপূর্বে 'সমদর্শী' ও 'সমালোচক' স্থাপন করিয়া তাহা পরিচালনা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মমিশন প্রেস স্থাপন করিয়া তিনি উহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দান করেন। ধর্ম-সমাজের কাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী পূর্ণ মাত্রায় প্রবর্তন, আধুনিক ভারতে নূতন জিনিস। শাস্ত্রীমহাশয় ও তাঁহার কতিপয় বন্ধুর ইহা একটি কীর্তি। এই প্রণালী প্রবর্তন করিতে হইলে, বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গলনিয়মে যেমন বিশ্বাস চাই, মানবপ্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাও তেমনি আবশ্যক; সাহসেরও একান্ত প্রয়োজন। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সমুদয়ই ছিল। তাঁহার গৃহে অনেক অনাথ ও বিধবা আশ্রয় পাইয়া মানুষ হইয়াছে। তাহাদের সাহায্যের জন্য তাঁহার গৃহদ্বার উন্মুক্ত ছিল। ...এই ভগবদ্ভক্ত, সত্যনিষ্ঠ, দ্বেষ-অসূয়া শূন্য, পরচর্চা-পরনিন্দা বিমুখ, মানবপ্রেমিক, দেশভক্ত, অক্লান্তকর্মী, নির্লোভ, ত্যাগী, জিতেন্দ্রিয়, সাধুপুরুষের কীর্তি অনেক। মনুষ্যত্বে তিনি তাঁহার সমুদয় কীর্তিরও বহু উর্ধ্বে। তথাপি তিনি নিজেকে অতি অধম মনে করিতেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহার মনুষ্যত্বের আদর্শ এত উচ্চ ছিল যে, তিনি তাহার তুলনায় আপনাকে হীন মনে করতেন।

'প্রবাসী', ১৩২৬

৩ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

পণ্ডিত শিবনাথ বাঙ্গলা দেশের একটা বিশেষ যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার যৌবনকালে, কলিকাতায় ইংরেজী শিক্ষায় দীক্ষিত একদল বাঙ্গালীর মধ্যে একটা ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রবল বন্যা বহিয়া যাইতেছিল; যৌবনকাল হইতেই পণ্ডিত শিবনাথের জীবন— আমৃত্যু এই সংস্কার-স্রোতের মধ্যেই প্রবাহিত হইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালীর ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারযুগের ইতিহাসের সহিত পণ্ডিত শিবনাথের জীবন ঐতিহাসিক অমরত্বের দাবী রাখে;

Scanned by CamScanner

বাঙ্গলাদেশে পণ্ডিত শিবনাথের সমসাময়িক এমন অনেকে ছিলেন, অনেকে এখনও আছেন, যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি এমন কি ধর্ম ও চরিত্রবলেও শিবনাথ অপেক্ষা কম নহেন। অথচ তাঁহারা পণ্ডিত শিবনাথের মত ঐতিহাসিক অমরত্বের দাবী রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। শিবনাথের জীবন যেমন যৌবনকালের উন্মেষ হইতেই একটা ইতিহাসের স্মরণযোগ্য সংস্কার-স্রোতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাঁহাদের তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। অবশ্য এই সংস্কার-স্রোতের বিরুদ্ধ স্রোতাবর্তে যাঁহাদের জীবন ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের জীবনও ঐতিহাসিক অমরত্বের দাবী রাখে; ইতিহাসের যাহা উপাদান, জীবনে এমন কিছু থাকা চাই।

ব্রাহ্ম সংস্কারযুগের আদ্যোপান্ত একটা ইতিহাস আছে; পণ্ডিত শিবনাথই তাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। যাহারা ইতিহাস গড়ে, তাহারা প্রায়ই ইতিহাস লিখিবার সময় পায় না। কিন্তু পণ্ডিত শিবনাথ ব্রাহ্ম সংস্কারযুগের ইতিহাস শুধু লেখেন নাই, এই যুগের শেষ অধ্যায়ের ইতিহাসে তিনি বিশেষ রকমেই গড়িয়াছেন; অথচ যতটা গড়িয়াছেন ততটা হয়ত লিখিয়া যাইতে পারেন নাই।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে নিয়মতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া, সেই নিয়মতন্ত্রের মধ্যে থাকিয়া, আচার্য শিবনাথ ১৮৭৮ হইতে ১৯১৯ খৃ. এই ৪২ বৎসর একাদিক্রমে সাক্ষাতে ও পরোক্ষে এই কেশব-বিরোধী নূতন সমাজের নেতৃরূপে ইহাকে পরিচালিত করিয়াছেন। এই ৪২ বৎসরের নেতৃত্বের মধ্যে ইতিহাস বা জীবনচরিতে স্মরণযোগ্য কোন প্রতিবাদ তাঁহার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উত্থাপন করিবার সুযোগ পান নাই। এইখানেই শিবনাথ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা; এইখানেই বলা যাইতে পারে যে, কেশবচন্দ্রের একাধিপত্যমূলক যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে যে তিনি একদিন ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা কেশবের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-প্রসূত নহে; তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কেননা তাঁহার প্রকৃতিতে সত্যই নিয়মতন্ত্রের বীজ নিহিত ছিল।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলায় যাঁহারা সমাজে ও রাষ্ট্রে নেতার অংশ গ্রহণ করিয়া অভিনয় করিয়াছেন, ও করিতেছেন, যে-সমস্ত বাঙ্গালী রাষ্ট্রে, প্রাদেশিক ক্ষেত্রে ও এমন কি, কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অতি অল্পসংখ্যক নেতাই নিয়মতন্ত্রকে জীবনে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মত, সাধনা করিয়া গিয়াছেন।

নিয়মতন্ত্রকে সাধনার কথা আমি বলিলাম। বস্তুতই এ যুগে ইহা সাধনারই বস্তু। সংঘবদ্ধ হইতে না পারিলে, জীবনে-সংগ্রামে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। আমাদের মত একটি প্রাচীন, জীর্ণ, বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন ও শিথিল এবং সর্বোপরি, দরিদ্র জাতিকে এ যুগে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সংঘবদ্ধ হইতে হইলে, একটি আদর্শের অনুপাতে সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। নিয়মতন্ত্রের ভিত্তির উপরেই সংঘবদ্ধ হওয়া এ যুগে অধিকতর নিরাপদ। অবশ্য সম্পূর্ণভাবে আপৎশূন্য কোন আদর্শই এ পর্যন্ত মনুষ্য চিন্তা করিয়া আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আপদ বিপদের মধ্য দিয়াই সমাজকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে ও হইতেছে।

Scanned by CamScanner

ভবিষ্যতে এই আপদ-বিপদ যত কম হয়, প্রত্যেক সভ্যদেশের জননায়কগণের তাহাই একমাত্র চিন্তার বিষয়। পণ্ডিত শিবনাথ নিয়মতন্ত্রের সাধনা করিয়া বাঙ্গালীকে এ বিষয়ে একটি আদর্শ দিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস একদিন পণ্ডিত শিবনাথের এই আদর্শের সুবিচার করিবে, এই আশা করা যায়।

বাঙ্গলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রাজা রামমোহন হইতেই এই নিয়মতন্ত্রের উপর সমাজের বিভিন্ন অংশকে এ যুগে আবার সংহত ও সংঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে। নিয়মতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় অনেক সময় নেতার পক্ষে আত্ম-বিলোপ আবশ্যক হইয়া পড়ে। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন রামমোহন রায়। গণতন্ত্রের অনুশাসনে ও নিয়মতন্ত্রের সম্মানার্থে রাজা রামমোহন স্বেচ্ছায় এই হিন্দু কলেজের কার্য-নির্বাহক সমিতি হইতে সানন্দে সরিয়া আসিলেন। এইখানে রামমোহন ডিমোক্র্যাট। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র গণতন্ত্রের অনুরোধে রামমোহন প্রদর্শিত এই প্রকার আত্মবিলোপ অতি অল্পই দেখা গিয়াছে; রাজা রামমোহন-চরিত্রের এই দিকটা দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের পর আমাদের পরলোকগত পণ্ডিত শিবনাথের চরিত্রেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পণ্ডিত শিবনাথ এই জন্য বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালারও একজন নেতা।

'নারায়ণ', কার্তিক ১৩২৬

৪ বিপিনচন্দ্র পাল

... কলিকাতা সমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যেরূপ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেও সেইরূপ কেশবচন্দ্রের একতন্ত্র-শাসন বা অটোক্র্যাসি (autocracy) প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বাধীনচেতা ব্রাহ্মেরা এই জন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত 'সমদর্শী' নামক বাঙলা পত্র এই প্রতিবাদী দলের মুখপত্র হইল। যে যুক্তির ও ব্যক্তিগত ধর্মবুদ্ধির বা conscience-এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইয়াছিল, 'সমদর্শী' সেই আদর্শেরই প্রচার করিতে লাগিল। এই পত্রের লেখকেরা ধর্মসম্বন্ধীয় সকল মতবাদের উপরে প্রখর যুক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার সত্যাসত্যের বিচার করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর আছেন কি না, ঈশ্বরের উপাসনার আবশ্যকতা কি, প্রার্থনার যুক্তিযুক্ততা এবং উপকারিতা, পরলোক আছে কি নাই, ধর্মের এই সকল মূল প্রশ্ন লইয়া ইঁহারা নির্ভীকভাবে সর্ব সংস্কার বর্জিত হইয়া বিচার করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে কেশবচন্দ্র যে-বৈরাগ্যের সাধন করিতেছিলেন এবং যে-ভাবুকতাপ্রবণ ভক্তিবাদ ব্রাহ্মসমাজে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহারও তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র যে নিরঙ্কুশ যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সংযত করিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং এইজন্য 'প্রেরিত মহাপুরুষবাদ' ও 'ঈশ্বর আদেশবাদ' প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মমতের আশ্রয় লইয়াছিলেন, 'সমদর্শীয়' দল সেই নিরঙ্কুশ যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শকেই ব্রাহ্মসমাজে রক্ষা করিবার জন্য

Scanned by CamScanner

প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের প্রকৃতির মধ্যেও একটা রক্ষণশীলতা ছিল। এই রক্ষণশীলতার প্রেরণায় তিনি ধর্মনীতির নামে মানবপ্রকৃতির সহজ স্বাধীনতাকে কোনও কোনও দিকে আটকাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। এইজন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেও একটা স্বাধীনতার সংগ্রাম বাধিয়া উঠে। কুচবেহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইলে এই বিরোধটা ফুটিয়া উঠে; এবং মহর্ষির নেতৃত্বাধীনে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ একদিক যেমন ভাঙিয়া দুইভাগ হইয়াছিল, কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজও সেইরূপ ভাঙিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল।

ব্রাহ্মসমাজে যখন এইরূপে ভাঙাভাঙি ও ভাগাভাগি হইতেছিল, তখন ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে দেশের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও চারিদিকে একটা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠিতেছিল। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম এবং সমাজ-সংস্কার লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। এই সংস্কার-কার্যে ব্রাহ্মেরা দেশের রাজপুরুষদিগের সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজের সঙ্গেই এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ ছিল। হিন্দুসমাজ যথাসাধ্য ব্রাহ্মদিগকে নির্যাতনও করিতে ছাড়েন নাই। ব্রাহ্মেরা দেখিলেন যে হিন্দু যদি দেশের রাজা থাকিতেন, তাহা হইলে খৃষ্ট-ধর্মের অভ্যুদয়কালে রোমক সাম্রাজ্যে খৃষ্টীয়ানদিগের যে-দশা হইয়াছিল, এই হিন্দুরাজ্যে ব্রাহ্মদিগেরও সেই দশাই হইত। ইংরাজরাজ এ দেশে প্রত্যেক প্রজাকে তাহার ধর্মসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা দিয়াছে বলিয়াই ব্রাহ্মেরা নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী চলিতে পারিতেছেন। ইংরাজ-রাজপুরুষেরা প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদের এই সংস্কার-ব্রতের প্রশংসা করিতেন। এই সকল কারণে ব্রাহ্মসমাজে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা প্রথম প্রথম ভাল করিয়া জাগিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ যখন কেবল ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, সে সময়ে দেশের শিক্ষিত-সাধারণের মধ্যে অল্পে অল্পে একটা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণাও জাগিয়া উঠিতেছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের একনায়কত্বের প্রতিবাদিগণ অনেকেই একটা সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার আদর্শের প্রেরণায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ সেকালের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেরও নায়কত্বলাভ করেন। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় ভারত-সভার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েন। কুচবেহার বিবাহের প্রায় একসময়ে ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা হয়। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ভারত-সভার সহকারী-সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ভারত-সভার কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন। ইঁহারা সকলেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের একনায়কত্বের বিরোধী ছিলেন। যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন, ইঁহারা তাহাদের অগ্রণী ছিলেন। সুতরাং কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে নূতন স্বাধীনতার আদর্শ যতটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে তাহা তদপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিতে লাগিল। আনন্দমোহন বসু এবং শিবনাথ শাস্ত্রী উভয়ের মধ্যেই একটা গভীর স্বদেশ-প্রেমেরও প্রেরণা ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে সর্বপ্রথমে স্বদেশের স্বাধীনতার আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। কেশবচন্দ্রের প্রবর্তিত উপাসনা-প্রণালীতে জগতের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিবার প্রথা প্রবর্তিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী

Scanned by CamScanner

মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্যরূপে প্রথম প্রথম সামাজিক উপাসনাতে স্বদেশের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিবার রীতি প্রবর্তিত করেন। এ সময়ে তিনি স্বদেশের মুক্তি-কামনায় যে-সঙ্গীত রচনা করেন, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত পুস্তকে বোধ হয় সেইটিই একমাত্র স্বদেশী সঙ্গীত। এখনকার ব্রাহ্মেরা সেই সঙ্গীতটি প্রায় ব্যবহার করেন না বলিয়া লোকে তার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। এইজন্য সেই সঙ্গীতটি তুলিয়া দিলাম।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ — ঠুংরি

তব পদে লই শরণ, প্রার্থনা কর গ্রহণ।
আর্যদের প্রিয় ভূমি সাধের ভারত ভূমি
অবসন্ন আছে অচেতন হে;
একবার দয়া করি, তোল করে ধরি,
দুর্দশা-আঁধার তার করহ মোচন।
কোটি কোটি নরনারী, ফেলিছে নয়নবারি
অন্তর্যামী জানিছ সে সব হে;
তাই প্রাণ কাঁদে, ক্ষমা অপরাধে
অসাড় শরীরে পুন দেও হে চেতন।
কত জাতি ছিল হীন অচেতন পরাধীন
কৃপা করি আনিলে সুদিন হে;
সেই কৃপাগুণে দেখি শুভক্ষণে
সাধের ভারতে পুন আন হে জীবন।।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার কালে তাহার নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবার সময়ে আমরা কেবল ব্রাহ্মসমাজের কথাই ভাবি নাই কিন্তু, ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের ছবিটাই আমাদিগের চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল। নূতন ব্রাহ্মসমাজে আমরা আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের একটা সর্বাঙ্গসুন্দর নমুনা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলাম। ইংলণ্ডের, আমেরিকার এবং ফরাসীদের রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের পরীক্ষা করিয়া তাহারই ছাঁচে আমাদিগের অবস্থার উপযোগী করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের Constitution (কনষ্টিটিউসন) গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমরা কেবল একটা সংকীর্ণ ধর্মসমাজই গড়িয়া তুলিতে চাহি নাই। আমাদের ব্রাহ্মসমাজ যে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রশক্তির বা State-এর আসনে যাইয়া বসিবে গোটা দেশটা ব্রাহ্ম হইয়া যাইবে এবং তাহার ফলে রাষ্ট্র ও ধর্মসমাজ এক হইয়া উঠিবে এরূপ অদ্ভুত কল্পনাও করি নাই। কিন্তু স্বাধীনতার এবং মানবতার সাধকরূপে ব্রাহ্মসমাজ যেমন একটা আদর্শ-পরিবার ও একটা আদর্শ-সমাজের প্রতিচ্ছবি গড়িয়া তুলিবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা লইয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিল, সেই স্বাধীনতার ও মানবতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিয়া একটা আদর্শ রাষ্ট্রযন্ত্র বা রাষ্ট্রতন্ত্রও গড়িয়া তুলিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিল। এই ভাবের প্রেরণাতেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের

Scanned by CamScanner

কনষ্টিটিউসনের মধ্যে আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের কনষ্টিটিউসনের একটা ছোটখাটো নমুনা দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমরা ভাবিয়াছিলাম যে এই ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মেরা গণতন্ত্রতা মক্স করিবেন! দেশের লোকেও ব্রাহ্মসমাজের কার্যপ্রণালীর ভিতর এই গণতন্ত্রতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন। এইভাবে ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম ও নীতিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে অতি উচ্চ অঙ্গের রাষ্ট্রীয় শিক্ষাও বিস্তার করিতে পারিবেন। নিজেদের কর্মদোষে এ আশা ফলবতী হয় নাই। কিন্তু এইজন্য চেষ্টার মূল্যও নষ্ট হয় নাই।

ফলত, ব্রাহ্মসমাজের ধর্মাচার্যদিগের মধ্যে শাস্ত্রী-মহাশয়ের ভিতরে স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শ যতটা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আর কাহারও মধ্যে ততটা ফোটে নাই। প্রথম যৌবনাবধি এই স্বাধীনতা এবং মানবতাই তাঁহার ধর্মের মূল উপাদান হইয়াছিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গৃহে জন্মিয়া, পরানুগ্রহে উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিয়া, শিবনাথ শাস্ত্রী সেই শিক্ষাকে কোনও দিন নিজের সাংসারিক উন্নতিসাধনে নিযুক্ত করেন নাই। মহর্ষি এবং ব্রহ্মানন্দ উভয়েই ধনসমৃদ্ধির মধ্যে জন্মিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন, জীবনে 'গুণরাশি-নাশী' দারিদ্র্য-দুঃখ যে কি ইহা ভোগ করেন নাই। শিবনাথ শাস্ত্রী ইচ্ছা করিলে ধনকুবের না হউন কিন্তু সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দতার মধ্যে অনায়াসে দিন কাটাইয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু সেদিকে কোনও দিন তাঁহার লোভ ছিল না। তাঁহার নিকটে সর্বাপেক্ষা লোভনীয় বস্তু ছিল স্বাধীনতা। তাহার নিকটে এই স্বাধীনতাই ধর্ম ছিল। প্রথম বয়সে তিনি সরকারী শিক্ষা-বিভাগে কর্ম গ্রহণ করেন; হেয়ার স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু বেশীদিন তাহাকে হেয়ার স্কুলে পড়িয়া থাকিতে হইত না। প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার অবসর লইবার কথা। তিনি অবসর লইলে প্রেসিডেন্সি কলেজের সহকারী সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে শিবনাথ শাস্ত্রীই প্রতিষ্ঠিত হইতেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই ছিল না। আর সেখান হইতে ক্রমে তিনি যে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে যাইয়া বসিতেন, একথাও ঠিক। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী এই লোভে পড়িলেন না।

স্বদেশের সেবাতে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্যই তিনি ছটফট করিতেছিলেন। সে সময়ে আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতায় শিশিরকুমারের 'অমৃতবাজার', বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ,' এবং অক্ষয়চন্দ্রের 'সাধারণী'র লেখায়, 'বঙ্গদর্শনের' ও 'আর্য্যদর্শনের' আলোচনায়, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের কবিতায়, দীনবন্ধু এবং উপেন্দ্রনাথ ও মনোমোহনের নাটকে এবং কলিকাতার ন্যাশন্যাল থিয়েটার ও বেঙ্গল থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে একটা প্রবল স্বদেশপ্রেমের বন্যা ছুটিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ যে-স্বাধীনতার আদর্শকে ধর্মসাধনে ও পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাকেই রাষ্ট্রীয় শাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দেশের শিক্ষিত লোকেরা লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীনতার সাধকেরা এই স্বদেশপ্রেমকে তাঁহাদের ধর্মজীবনের আদর্শের অঙ্গীভূত করিয়া নিজেদের স্বাধীনতার আদর্শকে পরিপূর্ণ

Scanned by CamScanner

ও সর্বাঙ্গীণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজের এই স্বাধীনতার সাধকদিগের অগ্রণী হইয়া উঠেন।

এই সময়েই শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনিই আমাদের স্বাধীনতার সাধনার ও স্বদেশচর্যার প্রথম দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। তাঁহার নায়কত্বে আমরা ক'জন মিলিয়া একটা ছোট দল গড়িবার চেষ্টা করি। আমাদের প্রতিজ্ঞা-পত্রের প্রথম কথা ছিল—'স্বায়ত্ত-শাসনই (তখনও স্বরাজ শব্দের প্রচার হয় নাই) আমরা একমাত্র বিধাতৃ-নির্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি।" অর্থাৎ যে শাসন স্বায়ত্ত-শাসন নহে, শাসিতের উপরে ধর্মত তাহার কোনও অধিকার আছে বলিয়া আমরা মানি না। "তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্তমান গভর্ণমেণ্টের আইন-কানুন মানিয়া চলিব—কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গভর্ণমেণ্টের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না।"

এই প্রতিজ্ঞা-পত্রের দ্বিতীয় কথা ছিল—"আমরা জাতিভেদ মানিব না; পুরুষের পক্ষে একুশ বৎসরের পূর্বে এবং রমণীয় পক্ষে ষোল বৎসরের পূর্বে বিবাহ করিব না, বিবাহ দিব না এবং বিবাহে সাহায্য করিব না।" তৃতীয় কথা ছিল—"লোকশিক্ষা প্রচারে প্রাণপণ যত্ন করিব।" চতুর্থ কথা ছিল—"অশ্বারোহণ, বন্দুক ছোড়া (তখনও অস্ত্র-আইন প্রচলিত হয় নাই) প্রভৃতি নিজেরা অভ্যাস করিব এবং অপরকে অভ্যাস করিতে প্রণোদিত করিব।" পঞ্চম কথা ছিল—"আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন বা রক্ষা করিব না, যে যাহা অর্জন করিবে তাহাতে সকলের সমান অধিকার থাকিবে, এবং সেই সাধারণ ভাণ্ডার হইতে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বদেশের হিতকর কর্মে জীবন উৎসর্গ করিব।"

শাস্ত্রী মহাশয় তখনও হেয়ার স্কুলে পণ্ডিতী করেন। এইজন্য প্রথম দীক্ষার দিনে তিনি এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইহার ছয়মাস পরে সরকারের কর্মে ইস্তফা দিয়া তিনি নিয়মমতো দীক্ষা লইয়া এই দলভুক্ত হয়েন। দলটা যে খুব বড় ছিল তাহা নহে। স্বর্গীয় কালীশঙ্কর সুকুল, 'হেলেনা কাব্য', 'মিত্র কাব্য', 'ভারতমঙ্গল' প্রভৃতি রচয়িতা স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র মিত্র, সেকালের ব্রাহ্মসমাজের অপরিচিত এবং সকলের শ্রদ্ধাভাজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায়, হাইকোর্টের ভূতপূর্বে প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী, (ইনি পরে ব্রজবিদেহী সন্ত দাস নামে ভারতবর্ষের বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত), শ্রীযুক্ত ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস এবং আমি—আমরা এই কয়জনই প্রথমদিন এই দীক্ষা গ্রহণ করি। ইহার পরে শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোম ও শ্রীযুক্ত উমাপদ রায়, ইঁহারা এই দলভুক্ত হয়েন। ইহা ১৮৭৬-৭৭ ইংরাজীর কথা। আমরা এই প্রতিজ্ঞার সকলগুলিই যে রক্ষা করিতে পারিয়াছি, একথা বলিতে পারি না। যে কমিউনিজমের (Communism) আদর্শে আমরা এই দলটা বাঁধিতে গিয়াছিলাম, অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে না, সাধারণ অর্থভাণ্ডারে নিজ নিজ উপার্জিত অর্থ দান করিব, এবং সেই ভাণ্ডার হইতে প্রয়োজনপোযোগী বৃত্তি লইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিব—এই আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে পারি নাই, কিন্তু অন্যান্য প্রতিজ্ঞাগুলি সকলেই রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

Scanned by CamScanner

শাস্ত্রী মহাশয়ের দীক্ষা গ্রহণের কিছুদিন পরেই ব্রাহ্মসমাজে কুচবেহার বিবাহ লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেরও প্রতিষ্ঠা হয়। শাস্ত্রী মহাশয় সমাজের আচার্য ও প্রচারক নিযুক্ত হন। সমাজের কর্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াতে আমাদের এই দল-গঠনের প্রতি তিনি আর মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। আমরাও অনেকে অপরিণত বয়স্ক শিক্ষার্থী যুবকমাত্র ছিলাম। সুতরাং এই দলটি আর গড়িয়া উঠিল না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের ইতিহাসের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ একসময় যে সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার আদর্শের পানে ছুটিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'নবযুগের বাংলা', ১৩৬২

৫ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির। এগারোই মাঘ উপলক্ষ্যে মন্দিরের ভেতর-বার নানা লতাপাতা ও ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। ভেতরে গ্যাসের বাতি জ্বলছে, সিলিঙে দুটো বড় বড় গ্যাসের ঝাড় জ্বলছে, আর চলেছে খোলকরতালসহ কীর্তন।

স্থবির চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। কীর্তনীয়ার দল ততক্ষণে শ্রান্ত হয়ে যে-যার একটু জায়গা যোগাড় করে র‍্যাপারে সর্বাঙ্গ ঢেকে ধ্যানস্থ হয়ে বসেছেন। মন্দিরগৃহ লোকে পরিপূর্ণ। গ্যাসের আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানলা দরজা দিয়ে ভোরের মৃদু আলো আসায় ফুলসজ্জায় সজ্জিত মন্দিরগৃহ, দেওয়াল, থাম ও বেদী অপূর্ব শ্রীতে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

সকলেই উন্মুখ আগ্রহে যেন কিসের প্রতীক্ষায় রয়েছে। ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই আধ-আলো আধ-অন্ধকারের বুকে হঠাৎ ভৈরবীর সুরধারা নেমে এল করুণার প্রস্রবণের মতন—

হেরি তব বিমল মুখভাতি,
দূর হল গহন দুখ-রাতি।

স্থবির দেখতে পেলে, তাদের একটু দূরে একজন কালো প্রিয়দর্শন যুবক কোকিলকণ্ঠে গান শুরু করেছে। গানের বাচ্যার্থ অথবা ভাবার্থ বোঝবার মতন বয়স বা শিক্ষা তার তখনও হয় নি, তবুও তার মনে হতে লাগল, তীক্ষ্ণ বিষব্যালীর ওপর এ যেন বিশল্যকরণীর প্রলেপ, কোথা থেকে—কোন্ অদৃশ্যলোক থেকে আসছে যেন আশার বাণী, কি আনন্দের উৎস রয়েছে ভৈরবের ওই ভৃঙ্গারে।

গান শেষ হতেই আচার্য ঢুকলেন মন্দিরে। সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের মুখ্য আচার্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ ব্যক্তি। লম্বা দাড়ির অধিকাংশই পাকা। মাথায় বিরল রুক্ষ কেশ। গায়ে একটা সবুজ রঙের ফ্ল্যানেলের শার্ট। মুখ দেখলেই মনে হয়, সাধারণ লোকের সঙ্গে এঁর যেন কোথায় একটা প্রভেদ রয়েছে। স্থবির শাস্ত্রী মহাশয়কে চিনত। চলতি কথায় বলতে গেলে, তিনি তাদের কুলগুরু। শাস্ত্রী মশায় তার পিতাকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন; মহাদেবের বিবাহেও তিনি পৌরোহিত্য করেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মরা গুরু মানে না, তাই বোধ হয় গুরু না ভেবে তারা তাঁকে গুরুর চাইতে আরও বড় একটা কিছু মনে করত। যাক,

Scanned by CamScanner

শাস্ত্রী মশায় এসে বেদীতে উঠে বসলেন। দু-তিনটি যুবক খাতা পেন্‌সিল নিয়ে বেদীমূলে বসে গেল আচার্যের উপদেশ সঙ্গে সঙ্গে লিখে নেবার জন্যে। শাস্ত্রী মশায় বেদীর ওপরে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে ভাঙা গলায় বললেন, সঙ্গীত।

সঙ্গীতান্তে শাস্ত্রী মশায় চীৎকার করে কি সব বলতে আরম্ভ করলেন। সে সব ভাল ভাল কথা, গূঢ় তার অর্থ, নানা অলঙ্কারপূর্ণ সে ভাষা—শিশুর কাছে তা প্রহেলিকা। স্থবিরের মনে হতে লাগল, এ যেন একটা ইস্কুল। বেদীর ওপরে বসে আছেন ওই মাস্টার মশায়—চেঁচিয়ে পাঠ বুঝিয়ে দিচ্ছেন। চতুর্দিকে এই সব নরনারী, তারা ছাত্র ও ছাত্রীর দল। এ ইস্কুলের ছাত্রছাত্রীকে বোধ হয় 'নাড়ুগোপাল' হতে হয় না, গলায় তাদের ইটের মেডেলও ঝোলে না।

স্থবিরের কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে একটি ভদ্রলোক বসেছিলেন, তাঁকে তারা চিনত। এই লোকটি সমাজের মধ্যে একজন নামজাদা গম্ভীর ও রাশভারী লোক। সে দেখলে, ইনিও নিঃশব্দে অশ্রুবিসর্জন করছেন। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুজল তাঁর বিশাল দাড়ির এখানে সেখানে আটকে নোলকের মতন দুলছে।

এই দৃশ্য দেখে স্থবির স্থির বুঝতে পারলে, ব্যাপারটি বিশেষ সুবিধাজনক নয়। নিশ্চয় কোনও অপরাধের জন্যে শাস্ত্রী মশায় তাঁদের ধমক দিচ্ছেন।

ইতিমধ্যে শাস্ত্রী মশায় চীৎকার করে উঠলেন, 'ওই যে বিহঙ্গ শূন্যপথে মুক্তপক্ষে প্রয়াণ করিল—'

স্থবিরের পাশের লোকটি, যিনি এতক্ষণ কান্নার সঙ্গে বিড়বিড় করে বকছিলেন, হঠাৎ তিনি ডাক ছেড়ে ডুকরে উঠলেন, জয় দয়ারাম, জয় দয়াময়—

স্থবির ভাবলে, এবার বোধ হয় শাস্ত্রী মশায় বেদী ছেড়ে নেমে এসে এদের প্রহার আরম্ভ করবেন। সে সন্ত্রস্ত হয়ে র‍্যাপারখানা টেনে গায়ের সঙ্গে সেঁটে উদ্‌গ্রীব হয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়, তারই অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু শাস্ত্রী মশায় বেদী থেকে নামলেন না। তাঁর চীৎকারের মধ্যে ধমকের সুরটা যেন ক্রমেই কমে আসতে লাগল। ক্রমে তা যেন একেবারে করুণ সুরে এসে পৌঁছল। তাঁর কণ্ঠস্বর ধাপে ধাপে নামতে নামতে শেষে অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

শিবনাথ শাস্ত্রী স্থবিরের পিতৃগুরু। তিনি যতক্ষণ চীৎকার করে পুরুষোচিত অভিব্যক্তিতে বলে যাচ্ছিলেন, ততক্ষণ তার ভালই লাগছিল। শুধু যে ভাল লাগছিল তা নয়, তাদেরই শাস্ত্রী মশায় যে এতগুলো লোককে ধম্‌কে কাঁদিয়ে বিপর্যস্ত করে তুলছিলেন, তার মধ্যে নিজেও সে খানিকটা গৌরব অনুভব করছিল। কিন্তু হঠাৎ তাঁরও সুর অনুনয়ের পর্দায় নেমে আসায় তার শিশুচিত্ত শুধু বিহ্বল নয়, কিছু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। স্থবিরের মনে হতে লাগল, কে সে নিষ্ঠুর, কোথায় তার বাড়ি, কেমন ভীষণ তার চেহারা, কত শক্তি সে ধরে, যাকে এমনভাবে অনুনয় করা হচ্ছে, অতি বড় পাষাণও যাতে দ্রবীভূত হয়!

স্থবির স্থির করলে, বড় হয়ে এইজনকে খুঁজে বার করতেই হবে। আজও স্থবির তারই অনুসন্ধানে ফিরছে।

'মহাস্থবির জাতক', ১৩৫১

Scanned by CamScanner